পেটার বিকসেলের গল্প : বিচ্ছিন্নতার কথোপকথন

অনিন্দিতা দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ

সুইজারল্যাণ্ডের গল্পকার পেটার বিকসেল (১৯৩৫ খ্রিঃ) তাঁর গ্রুপ্‌পে ৪৭ পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আর সত্যি ফ্রাউ ব্লুম গয়লার সঙ্গে দেখা করতে চান' গল্পগ্রন্থটিতে (১৯৬৪ খ্রিঃ) অনাড়ম্বর ভাষায় অনবদ্য নির্মাণ কৌশলে আধুনিক মানুষের অন্তর্লীন বিচ্ছিন্নতা ও ক্লান্তিকর পৃথিবীর নিরুপায়তাকে প্রশ্নাতীত সাফল্যে প্রকাশ করেছেন। দৈনন্দিন কিম্বা অভ্যস্ত স্বাভাবিকত্বের ক্যামোফ্লেজে আন্তরিক একাকীত্বের প্রগাঢ় অন্ধকারে ক্রমাগত পিছলে যাওয়া মানুষের ফাঁপা আর্তনাদটুকু প্রতিধ্বনিত হয়েছে গল্প জুড়ে। মানুষের ভিড় কিম্বা পরিবারের অভ্যন্তরে থেকেও চরিত্রগুলির এক গন্তব্যহীন বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আত্ম-অস্তিত্বের নির্জন কঙ্কালকে ছুঁয়ে থাকার বোধ আমূল আক্রান্ত করে আমাদেরও। তুর্গেনিভের গদ্য কবিতার মতোই অথচ কাব্যিকতাহীন ভাষ্যে অসহায় মমত্বে, কৌতুকে তা যেন বেঁচে থাকার বিষণ্ণ, বিচ্ছিন্ন একরঙা একঘেয়ে দর্শনটিকে আরো তীক্ষ্ণ প্রাখর্য্যে অনিবার্য প্রশ্নহীনতায় নগ্ন ও উন্মোচিত করে দেয়।

গল্পগ্রন্থটির অন্তর্গত 'চারতলা' গল্পটির শুরুতেই কল্পনা, অথচ কল্পজগৎটিও সুবিধার স্বার্থে নির্মিত। চারতলা বাড়ির সিঁড়িটি একদিকে উচ্চতা অনুসারে ভিন্ন তলার মেঝেগুলিকে পৃথক অস্তিত্ব প্রদান করে। একই সাথে 'সিঁড়ি' নামক ঐ পৃথগায়নের রূপরেখাটি আবার সংযোগসূত্রও বটে। অর্থাৎ পারস্পরিক সংযোগের মধ্যেও ভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার এক অন্তর্লীন স্রোত ক্রমিক প্রবাহিত হতে থাকে। দামি জমির উপর টালিবসানো ছাতওয়ালা চারতলা বাড়িটির আন্তরিক হীনমন্যতাও পরিস্ফুট তার 'কুঁকড়ে গুটিশুটি মেরে ঢুকে পড়া' এবং 'জানলাগুলো রাস্তার দিকে মুখ করা' সত্ত্বেও 'বাড়িটায় ঢুকতে হয় পিছন দিয়ে' বাক্যাংশটির মধ্য দিয়ে।

সংশয়ের অবর্ত বারবার পাক খেয়ে পেঁচিয়ে ওঠে গল্পের ঘোলাটে শরীর জুড়ে। বাড়িটির একতলার কোন বাসিন্দা আদৌ থাকে কিনা তা নিয়ে তিনটি বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যে দোলাচলতা তুঙ্গে ওঠে—

(ক) 'একতলায় কেউ থাকে না'[১]

(খ) 'হয়তো একতলায় কেউ থাকে না'[২]

(গ) 'কে জানে, হয়তো একতলায় কেউ একজন সত্যি থাকে'।[৩]

থাকা-না থাকা সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহের এই ক্রমিক আবর্ত কখন যেন দোতলা-তিনতলা-চারতলার 'কেউ একজন' থাকার অস্তিত্বকেও চূড়ান্ত ঋণাত্মকধর্মীতায় চিহ্নায়িত করে। অন্যান্য তলার বাসিন্দাদের বসবাসের বিক্ষিপ্ত-সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেও কোথাও স্থায়িত্ব কিম্বা স্থিতিশীলতার চিহ্ন পাওয়া যায় না, বরং কেমন যেন অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এক অস্পষ্ট প্রবাহের অন্তর্গত। এমনকি প্রবাহের উপাদানগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। প্রবাহটি একঘেয়ে ও একরঙাও বটে। এক স্রোতের সাথে আরেক স্রোতের বিশেষ ভিন্নতা দেখা যায় না—

"যেমন তখন বসন্ত। এপ্রিলের ৪ তারিখ। দোতলা আর তেতলার মধ্যেকার সিঁড়িতে
রোদ এঁকে যায় নানা রেখায় নকশা, ঠিক গত বছর যেমন এঁকেছিলো।"[৪]

চারটি তলার ভিন্ন ভিন্ন চিলেকোঠা, কিন্তু প্রতিটি খোপই একইরকম কুলুপ আঁটা। এমনকি প্রত্যেকটা খোপেই জমানো আছে পুরানো জাজিম, ফোটো অ্যালবাম, দিনপঞ্জী আর পুরানো আয়না। উল্লেখ্য চিলেকোঠায় বন্দী আমাদের একঘেয়ে দৈনন্দিনতা এবং আত্মসর্বস্ব প্রতিবিম্বনের ক্ষেত্র। অর্থাৎ আমাদের প্রতিটা দিন, বেঁচে থাকা এমনকি নিজস্ব প্রতিকৃতির মধ্যেও বিশেষ স্বাতন্ত্য নেই। 'ভিন্নতর' বলে আহামরি কিছু নেই। সমস্তই চূড়ান্ত একঘেয়ে। 'ফিরিওয়ালা' 'বনকর্মী', 'মেয়েরা' সকলেই তাদের নিজস্ব গতানুগতিক কর্ম ও ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর অসহায়ত্বে আবদ্ধ। গল্পের 'বাড়িরা বাড়িই'। তার কিম্বা তার বাসিন্দাদের বস্তুসত্তা ব্যতীত যেন আর কোন পৃথক সত্তা নেই। প্রত্যেকেই আসলে অচিহ্নিত, সীমায়িত এবং তীব্রভাবে বিচ্ছিন্ন।

তাঁর 'নভেম্বর' গল্পেও নামবিহীন সাধারণ মামুলি চরিত্রের ভীতি আশঙ্কা প্রত্যাশা ও স্বগতকথনের গতানুগতিকতায় নিজেদের মুখ ও মনকেও বিম্বিত হতে দেখা যায়। আসন্নপ্রায় প্রবল শীতের আতঙ্কিত আবহে ব্যক্তিটির নানামাত্রিক ভয়, অন্যজনের সাথে কথোপকোথনের মাধমে সান্ত্বনা পাওয়ার প্রত্যাশা ও অপঘাতে প্রত্যাশার অপমৃত্যু — সমস্তই যেন একান্ত পরিচিত। তার ইগো নির্মিত মানস প্রতিরক্ষণ কৌশলে আত্ম-প্রবোধ কিম্বা প্রবঞ্চনায় শীত, বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা অথবা শীতার্ত মৃত্যুকেই মানিয়ে নিয়ে জীবনের মেকি উত্তাপে উষ্ণ হওয়ার ক্ষীণ প্রয়াসে সেই প্রচলিত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তাই আবিষ্কৃত হয়। এমনকি, পার্শ্ববর্তী মানুষের নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়াটিও যেন একঘেয়ে এবং ছাঁচে ঢালা।

তাঁর 'সিংহরা' গল্পে ঠাকুর্দা চরিত্রের উপস্থাপন কৌশলে এবং 'সিংহে'র প্রতীকে প্রকৃতপক্ষে জীবন-মৃত্যুর ছকবন্দী মানুষের অধরা স্বপ্ন, বয়সের ভারে জীর্ণ স্বপ্নগুলির হারিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী স্বল্পবয়সীদের কল্পনায় একইভাবে আবার গুটিশুটি মেরে মিলে যাওয়া— এসমস্তই সূক্ষ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। শব্দগুচ্ছের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এই ক্লান্তিকর জীবনবৃত্তই যেন আলগোছে আঁকা হয়েছে। তাই অনেকের মতোই—

"ঠাকুর্দাও চেয়েছিলেন সিংহ পোষ মানাবেন, সিংহ খেলাবেন'[৫]
'জীবনে কোনো এক মূহুর্তে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে তিনি কোনদিনই সিংহ পুষতে পারবেন না'[৬]
'সিংহরা তাঁকে ছেড়ে গেছে খুব সন্তর্পণে।" [৭]
"তাঁর নাতিপুতিরা সিংহগুলোকেও নিয়ে গেছে, খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছে তাদের খাটের নীচে।"[৮]

এই ক্রমিক বয়োবৃদ্ধি, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া আমাদের অসচেতনে, বলা ভালো মনের অগোচরে ঘটে বলেই তার যন্ত্রণাটা ক্ষণে ক্ষণে টের পাওয়া যায় না। না হলে বয়সের সাথে সাথে কাঙ্খিত স্বপ্নের ধীর অবলুপ্তি কিছুতেই মেনে নেওয়া যেত না। ছিন্ন স্বপ্নের দগদগে ক্ষত হয়তো মুহুর্তে মুহুর্তে পীড়া দিত। কিন্তু তা হয় না—

> "ঠাকুর্দাকে কেউ কোনোদিন কিছু জিগেস করেনি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানগম্যি মোটেই বাড়েনি। কিন্তু বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাও খুব জরুরি— এই বুড়ো-হওয়া সিংহগুলোকে পিছনে ফেলে আসাতে খুব কষ্ট হতো তা না হলে। সিংহরা তাঁকে ছেড়ে গেছে খুব সন্তর্পণে, এতই সন্তর্পণে যে ঠাকুমা ও খেয়াল করেনি। ঠাকুর্দা মারা গেছেন, কারণ বড্ড মদ খেতেন।" [৯]

'তাঁর সন্ধ্যা' গল্পেও 'কথার ফাঁদে বন্দী' [১০]'একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত' [১১]সাধারণ তুচ্ছ এক বয়স্ক মানুষের জীবনযাপনের নানা অসহায় মুহুর্তকে নগ্ন ও উন্মোচিত করা হয়েছে। প্রাথমিক রহস্যময়তা কেটে যাবার পর বোঝা যায়— বৃদ্ধের এই কথোপকথন, বিরক্তিসূচক শব্দ ব্যবহার সমস্তই যেন একান্ত চেনাশোনার বৃত্তে আবদ্ধ। অকস্মাৎ অনুভব করা যায়— আত্মপ্রতিবিম্বকেই 'অপরে'র ভেবে সাময়িক সুখী কিম্বা বিভ্রান্ত হয়েছি মাত্র।

জীবনের পথে মৃত্যু থেকে মানুষ যখন দূরবর্তী পর্যায়ে থাকে, তখন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী অন্ত্যেষ্টি এবং মৃত মানুষদের সম্পর্কে অনেক কৌতুকমূলক বক্তব্য থাকে। তারপর একসময় মৃত্যু সংবাদে অভ্যস্ত হতে হতে বয়সের যখন সাথে সাথে নিজেরা তার কাছে পৌঁছে যাই, তখন মন্তব্যগুলি পাল্টে যেতে থাকে। কোথাও আর কোন উদ্দীপনা সম্ভবত অবশিষ্ট থাকে না—

> "আগে সে খববকাগজে শোকসংবাদগুলো পড়তো। 'যা-খুশি বলো, কিন্তু এখনও জগতে অনেক সজ্জন, আর নিরহংকার লোক আছে', সে মনে মনে ভাবতো। এখন সে আবিষ্কার করেছে যে সব শোকসংবাদই ছাঁচে ফেলা, আর সঙ্গের ছবিগুলো দেখলেই তার হাড়পিত্তি জ্ব'লে যায় আজকাল।"[১২]

বৃদ্ধের স্ত্রী সম্ভবত কিছুটা স্বল্পবয়সী। তাই সে একনও জীবনের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টুকরো টুকরো আনন্দ অস্বস্তি অথবা উপভোগ্য ঈর্ষাকে ছুঁয়ে ছেনে দেখতে চায়। কিন্তু বদ্ধাকে সে সমস্ত স্পর্শ করে না। সে যেন পুনরাবৃত্ত শব্দ ব্যবহারে তার ক্লান্তিকর, বিরক্তিবহুল ছোট্ট জগতকেই বারবার প্রকাশ করতে চায়। বৈচিত্র্যের বিপ্রতীপ এ এক ভিন্নতর শীতার্ত পৃথিবী। এখানে কেবল পাক খেতে হয়, মৃত্যু ভিন্ন পালাবার কোন রাস্তা নেই। বিকসেলের 'গয়লা' গল্পে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবির সাথে মধ্যবিত্ত কিম্বা উচ্চবিত্তের প্রয়োজনির্ভর বিনিময়প্রধান সম্পর্কের নেপথ্যে তাদের নিঃসঙ্গতার সমধর্মীতাকে ইঙ্গিতায়িত করা হয়েছে। গয়লার সাথে ফ্রাউ ব্লুমের পরিচিতির সূত্র একটাই—

> "দুধ নেন দু লিটার, মাখন একশো গ্রাম, তাঁর দুধের পাত্র তোবড়ানো।"[১৩]

গয়লা প্রত্যহ এমনকি ছুটির দিনেও ভোর চারটেয় দুধ দিয়ে যায়। তার দায়িত্বে কোথাও কোনো ত্রুটি কিম্বা অবহেলা থাকে না। অথচ ফ্রাউ ব্লুম সেই গয়লার মুখটিও কোনদিন দেখেননি। গয়লার সাথে তাঁর যেটুকু কথোপকথন তাও চিরকুটে লেখার মাধ্যমে সেটাও দুধ মাখনের হিসাব কিম্বা মূল্যবিষয়ক। হয়তো লিঙ্গগত সচেতনতার ফলেই পুরুষ গয়লাটির সম্পর্কে মহিলা ফ্রাউ ব্লুমের কৌতুহল ও কল্পনা দানা বাঁধে। কল্পনা কেবল হাত দুটোকে ঘিরেই, যে হাতে চিরকুট লেখে এবং দুধ দেয়। অর্থাৎ, প্রয়োজনমাফিক কল্পনা। তোবড়ানো দুধের পাত্রে গয়লার কাছে তার ইমেজটিও বেঁকেচুরে যাওয়ার আশঙ্কা জাগে। উল্লেখ্য, এই বস্তুচিহ্নটি তার একঘেমিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিত্বেরও পরিচায়ক। আবার নিম্নবিত্ত পুরুষ গয়লাটির কাছে অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জন করে বলেই কিঞ্চিৎ অধিকারবোধও নির্মিত হয়—

> "তিনি এটাও চান না যে সে পাশের বাড়ির মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা বলুক।" [১৪]

গয়লাটির (নামভিত্তিক কোন ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র পরিচয় নেই) সাথে পরিচিত হওয়া সম্পর্কে তাঁর ঔচিত্যবোধ জাগে, যা পরে তার ইচ্ছায় পরিণত হয়। কিন্তু তবুও এই উচিত এবং ইচ্ছার কোনো সমন্বিত পরিণতি পায় না। গয়লাও সামাজিক স্তরের এই ভিন্নতা এবং সীমানাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত

সচেতন। তাই সে ও চিরকুটে কেবল প্রয়োজন অভিযোগ ও বিনিময়ের কথা লেখে। একবিন্দু অনুভূতিও সেখানে ঠাঁই পায় না। সম্ভবত নিম্নবিত্ত গয়লা এবং মধ্যবিত্ত ফ্রাউ ব্লুম এভাবেই উচিত-অনুচিতের পরিচিত বৃত্তের প্রচলিত ছকে দৈনন্দিন পাক খায়। বৃত্ত ভাঙার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু যা না হয়ে ওঠাটাও এক অনিবার্য এবং চিরন্তন পরিণতি। অবশ্য শ্রেণীভিত্তিক চিহ্নায়ন বিকসেলের লক্ষ্য নয়, বরং মানুষের আন্তরপৃথিবীই তাঁর লেখার জগৎ। তাই শ্রেণীগত ভিন্নতা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গতায়, বিচ্ছিন্নতায়, একাকীত্বের একঘেয়েমিতে ফ্রাউ ব্লুম এবং গয়লা দুজনকেই সমানভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। আর এই সমতলের কারণেই সম্ভবত তাদের লিখন সংযোগ এত সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক।

তাঁর 'মেয়ে' গল্পটিতে চিত্রিত পারিবারিক আন্তর বিচ্ছিন্নতার ধূসর শূন্যতা যেন আকস্মিক আমাদের দর্শনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সন্তানের 'নিজস্বতা', 'স্বাতন্ত্র্য' ইত্যাদি গালভরা শব্দের আড়ালে তার সাথে তাল কেটে যাওয়া যোগাযোগের ফাঁক কিম্বা শূন্যতাটুকু অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। উপার্জনে সক্ষম, অধুনিক যাপনে অভ্যস্ত মেয়ের নাগরিক মনস্কতা নিয়ে ফাঁপা বিস্ময়ে প্রশংসনীয় আলোচনা করা যায়। কিন্তু সেই 'দূরতম দ্বীপ'টিকে বাবা-মা যেন কিছতেই ছুঁতে পারে না। স্মৃতি, কল্পনা এবং অপেক্ষার পুনরাবৃত্ত চক্রে তাদের প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়। যাপিত জীবনের মানোন্নয়নে মানস-বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি শহর-অভিমুখী মেয়ের সাথে স্থানিক বিচ্ছন্নতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবুও বিনষ্ট হয় না পরিবরের দৈনন্দিন আপাত স্বাভাবিকতা। আত্মিক বিচ্ছিন্নতার ধূসর কদর্যতাকে আপ্রাণ ঢেকে সফল সন্তানের প্রশংসার বিজ্ঞানটুকুতেই যন্ত্রণার মুখ ঢাকতে চায় তারা।

আলোচনান্তে বলা যায়, গল্পগুলিতে বয়স কিম্বা জীবনের ক্লান্তিতে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া, নতুনত্বে অনাগ্রহী মানুষগুলির সম্ভাবনাহীন জীবনের দর্পণে আকস্মিক আবিষ্কৃত হয়— বাইরের খোলসটুকু ছাড়া আমাদের প্রত্যেকের জীবন যেন নির্মমভাবে একইরকম। আসলে পেটার বিকসেলের প্রত্যেকটি গল্পই একেকটি প্রতিবিম্ব এবং তা আমাদের, যারা জীবনের পাকদণ্ডী বেয়ে নিঃসঙ্গভাবে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে তীব্র অবসাদগ্রস্ত। গল্পকার বিকসেলের চাপা স্বরে শুষ্ক তিক্ত পুনরাবৃত্তশব্দবয়ানে, 'হিটগেনস্টাইনীয় রসিকতার' [১৫] আবছা বিচ্ছুরণে একঘেয়ে বিচ্ছিন্নতার এই চোরাবালিটুকু প্রশ্নহীনভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

তথ্য ঋণ

১। পেটার বিকসেল, 'গল্পসংগ্রহ', মাইকেল কাটনার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ), প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০১১। অগ্রহায়ন ১৪৯৮, পৃ ১০
২। ঐ, পৃ ১০
৩। ঐ, পৃ ১০
৪। ঐ, পৃ ১০
৫। ঐ, পৃ ২০
৬। ঐ, পৃ ২০
৭। ঐ, পৃ ২১
৮। ঐ, পৃ ২১
৯। ঐ, পৃ ২২
১০। ঐ, পৃ ৯৩
১১। ঐ, পৃ ৯৩
১২। ঐ, পৃ ২৬
১৩। ঐ, পৃ ২৯
১৪। ঐ, পৃ ২৯
১৫। ঐ, পৃ ৯৩

গ্রন্থ ঋণ

আকর গ্রন্থ

১। পেটার বিকসেল, 'গল্পসংগ্রহ' মাইকেল কাটলার, মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনুবাদ), প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০১১, অগ্রহায়ণ ১৪১৮।